তৃতীয় অধ্যায়

মধ্য প্রস্তর যুগ

মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের নিরিখে দ্বিতীয় যুগ হল মধ্য প্রস্তর যুগ বা মধ্যাশ্মীয় যুগ (Mesolithic age)। কোনো কোনো গবেষক এই যুগকে শেষ প্রস্তর যুগ বা Late Stone age বলেও চিহ্নিত করেছেন। আবার হাতিয়ারের ধরনের ভিত্তিতে একে বহু গবেষক ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগ বা ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগ (Microlithic age) নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। এইসময় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ভূতাত্ত্বিকভাবে প্লেইস্টোসিন যুগের অবসান ঘটে হলোসিন যুগের সূচনা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তুষারযুগের অবসান ঘটে এবং জলবায়ু ক্রমশ উষ্ণ হতে শুরু করে। এর ফলে তুষার গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্যের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের বা মানুষসদৃশ প্রজাতির মধ্যেও বিবর্তন ও অভিযোজন ব্যাপকভাবে দেখা যায়। অধিকাংশ মানুষসদৃশ প্রজাতিই অবলুপ্ত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় আধুনিক মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স। এই আধুনিক মানুষের হাত ধরেই তুষারযুগ পরবর্তী পর্যায়ে জন্ম হয় এক নতুন পুরাতাত্ত্বিক হাতিয়ার সংস্কৃতির যুগ, যার নাম মধ্য প্রস্তর যুগ।

সময়কাল

মধ্য প্রস্তর যুগ ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন; দেশে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে এর বিকাশ ঘটেছে। ইউরোপের ক্ষেত্রে আনুমানিক ১৫০০০ থেকে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এই যুগের বিস্তার। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে তা ২০০০০ থেকে ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুগের প্রাচীনতম নিদর্শনের সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে

চিত্র ২১: ক্ষুদ্রাশ্ম

আনুমানিক দ্বাদশ সহস্রাব্দ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শুধু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে এই সংস্কৃতির বিস্তারের কারণেই নয়, ব্যবহৃত তারিখ নির্ধারণ পদ্ধতির কারণেও এই যুগের সঠিক প্রাচীনত্ব নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বেশিরভাগ প্রত্নকেন্দ্রে তারিখ নির্ধারণের জন্য রেডিও-কার্বন ডেটিং পদ্ধতি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তারিখ কার্বনের অর্ধ-জীবন (Half life)-এর উপর নির্ভর করে প্রাক্-বর্তমান (Before Present/B.P.) এককে নির্ণীত হয়। এই একক থেকে সাধারণ বর্ষপঞ্জির তারিখে (calender date) রূপান্তরের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। তাই খুব সুনির্দিষ্টভাবে প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। তবে আনুমানিকভাবে একটি মোটের উপর সময়সীমা এভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

আবহাওয়া— জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের পৃথিবীর আজকের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মধ্য প্রস্তরযুগীয় পরিবেশের খুব পার্থক্য ছিল না। বরং তার ঠিক পূর্ববর্তী যুগ অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর যুগের সঙ্গে এই পার্থক্য ছিল আমূল। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষের দিকে জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করে। তুষার যুগের ক্রমসমাপ্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আনুমানিক প্রায় ১১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তুষার যুগের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ কী ছিল তা নিয়েও গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য বর্তমান। কোনো কোনো গবেষক এর জন্য সমুদ্রের উষ্ণ স্রোতকে দায়ী করেছেন। আবার কোনো কোনো গবেষক এর জন্য মহাবিশ্বে পৃথিবীর অবস্থানের পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। কারণ যাই হোক, তুষার যুগের অবসান তথা এই প্রাগৈতিহাসিক বিশ্ব-উষ্ণায়ণের পরিণামে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অত্যন্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপক বন্যাও দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত এই ব্যাপক বন্যারই স্মৃতি প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের জনশ্রুতি ও রূপকথায় মহাপ্লাবনের কাহিনি রূপে (Great Deluge)। উষ্ণায়ণ ও বন্যার ফলে বহু জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যায়। যারা অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষমও হয়, তাদেরও শারীরবৃত্তীয় ক্ষেত্রে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। এইভাবে এক অস্থির প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল এ-সময়। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ সহস্রাব্দ নাগাদ পরিবেশে স্থিতিশীলতা আসে এবং প্রায় আজকের মতোই প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

হাতিয়ারের প্রকৃতি— ক্ষুদ্রাশ্ম

ক্ষুদ্রাশ্ম বা মাইক্রোলিথ (Microlith) বলতে বোঝায় অতিক্ষুদ্র বা ছোটো ছোটো নুড়ি আকারের পাথরের হাতিয়ার। প্রাচীন প্রস্তর যুগের একেবারে শেষ দিয়ে মানুষের ব্যবহৃত

হাতিয়ারের আকার ক্রমশ ছোটো হতে শুরু করে অর্থাৎ ছোটো আকারের সুবিধাজনকভাবে ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর ক্ষুদ্রাকার। গড়ে পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা হাতিয়ার এ-যুগে প্রায় দেখাই যায় না। প্রকৃতিগতভাবে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরিণত পর্যায়ের শেষ দিকের হাতিয়ারের সঙ্গে ছোটো আকৃতি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য মধ্য প্রস্তরযুগীয় হাতিয়ারের ছিল না। ফলা, চাঁচনি, বাটালি, ছেদক প্রভৃতির পাশাপাশি অর্ধচন্দ্রাকার আকৃতির কিছু হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়া বেশ কিছু ছোটো ছোটো আয়তাকার ও ত্রিভুজাকার হাতিয়ারও পাওয়া গেছে। এই যুগে হাতিয়ার নির্মাণের জন্য মূলত চার্ট, কোয়ার্টজ, ব্যাসল্ট, চ্যালসিফেডন, কেলাসিত সিলিকা জাতীয় পাথর ব্যবহৃত হত। এই যুগে ব্যবহৃত বেশ কিছু উত্তল-অবতল ও সমপার্শ্বভাগ যুক্ত চাঁচনি ও তুরপুনের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত হাতিয়ারগুলি কিন্তু ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা হত না। এগুলি কোনো বড়ো গাছের ডাল বা পশুর অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত করে যৌগিক হাতিয়ার (composite tool) হিসাবে ব্যবহার করা হত। অনেক সময়ে পাথরের পরিবর্তে পশুর হাড়, বাঁশ ও গাছের ডাল, পশুর শিং প্রভৃতিও হাতিয়ার নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

জীবন যাপন প্রণালী

মধ্য প্রস্তর যুগের জীবনযাত্রার ধরন তথা সার্বিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, বস্তুত এই কালপর্বটি ছিল একটি সেতুবন্ধের পর্ব— প্রাচীন প্রস্তরযুগীয় আদিম বন্যতা এবং নব্য প্রস্তরযুগীয় বিপ্লবের মধ্যেকার সেতুবন্ধ। তাই বলা বাহুল্য যে, এই যুগ যে কেবলমাত্র হাতিয়ার নির্মাণের প্রকৌশলের দিক থেকেই উন্নতি করেছিল তা নয়, এই উন্নয়ন ছিল সার্বিক। বিবর্তনের দিক থেকেও এই যুগের সূচনার আগেই হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স তথা আজকের মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং একথা বলা ভুল হবে না যে এই সংস্কৃতি একান্তভাবেই আধুনিক মানুষের তৈরি সংস্কৃতি— কোনো মানুষ-সদৃশ প্রজাতির দ্বারা তৈরি নয়।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে প্রাচীন প্রস্তর সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে খাদ্য-সংগ্রাহক সংস্কৃতি। অর্থাৎ আদিম মানুষ এবং মনুষ্য-সদৃশ অন্যান্য প্রজাতির জীববৈচিত্র্য বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করত শিকার ও গাছের ফলমূল সংগ্রহের উপর। খাদ্য উৎপাদন অর্থাৎ কৃষিকাজ কিন্তু এই যুগে দেখা যায়নি। কিন্তু মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষের খাদ্য-সংগ্রাহক জীবনে আসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এই সময় থেকেই ক্রমশ খাদ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তবে তখনও পর্যন্ত কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের কৌশল পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি মানুষ। প্রকৃতভাবে কৃষিকাজ শুরু হয়েছে আরও পরে— নব্য প্রস্তর যুগে। মধ্য প্রস্তর যুগে

ক্রমশ পশুকে পোষ মানানোর কৌশল মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছিল। আগুনের ব্যবহারও ইতিমধ্যে মানুষ ভালোভাবেই রপ্ত করে নিয়েছিল। পশুকে পোষ মানানোর ফলে শিকারলাভের অনিশ্চয়তা অনেকটাই দূর হয়েছিল। বেশ কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্র থেকে বুনো যব ও গমের সঙ্গে কৃষিজ শস্যের দানাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-থেকে অনুমান করা যায় যে, কৃষিকাজকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে।

আগুনকে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাপনের ধরন বদলে গিয়েছিল আমূলভাবেই। বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্র থেকে পোড়া দাগ, পোড়ানোর গর্ত এবং পোড়ামাটির টুকরো প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে কাঠকয়লা জাতীয় জ্বালানি ব্যবহারের নিদর্শন দেখা যায়নি। এ-থেকে মনে হয় সম্ভবত শুকনো ঘাসপাতাকেই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত। আগুন মানুষের জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাকে ঈশ্বরের আসনে বসানো হয়েছিল। হাতিয়ার নির্মাণ করার জন্যও ক্রমশ আগুনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষের দিকে আগুনের উপর নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গুহাশ্রয়গুলিতে মানুষের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পশুপালন শুরু হওয়ার পর প্রয়োজন হয়ে পড়ে সমতল অঞ্চলে বসবাসের। সমতল তৃণভূমি অঞ্চলে গুহাশ্রয় পাওয়া কষ্টসাধ্য। তাই ক্রমশ কৃত্রিম বসতি নির্মাণের কৌশল মানুষ আয়ত্ত করে। তবে মধ্য প্রস্তর যুগের শেষের দিকে এসেই এই ধরনের বিকাশ দেখা যায়। কৃত্রিম বসতি বলতে মূলত খড় ও নলখাগড়া জাতীয় চালাঘর নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া গেছে বেশ কিছু মধ্য প্রস্তরযুগীয় প্রত্নকেন্দ্র থেকে। তবে গুহাশ্রয়গুলির বসতিও ধারাবাহিকভাবেই বজায় ছিল।

মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। তৃণভোজী বড়ো আকারের পশুর মাংস উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে মানুষের খাদ্য তালিকায় স্থায়ী স্থান গ্রহণ করেছিল। মধ্য প্রস্তর যুগে যৌগিক হাতিয়ারের সুচারু ব্যবহার এবং ক্ষুদ্রাশ্মের প্রয়োগের ফলে জলজ প্রাণী, বিশেষত মাছ খাদ্যতালিকায় স্থান লাভ করে। ক্রমশ শস্যদানা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। একাধিক প্রত্নকেন্দ্র থেকে জোয়ার, যব ও গমের পোড়া দানার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-থেকে বোঝা যায় যে, কাঁচা খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস প্রায় পুরোপুরিই পরিত্যক্ত হয়েছিল। আগুনে পোড়ানোর পাশাপাশি এই যুগের শেষের দিক থেকে মৃৎপাত্রের ব্যবহার রন্ধন কৌশলের বিকাশের পরিচয় দেয়। শস্যদানার ব্যবহার মানুষের শরীরে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের জোগান বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে মাছ ও মাংস আগের মতোই প্রোটিনের জোগান দিতে থাকে। সব মিলিয়ে প্রায় আজকের খাদ্য-তালিকার মতোই মানুষের এক সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে এই সময় থেকে।

মধ্য প্রস্তর যুগে প্রকৌশলগত বিকাশের পাশাপাশি মানুষের নান্দনিক বোধের বিকাশও ভালোভাবেই দেখা গিয়েছিল। এর সাক্ষ্য বহন করে সেই সময়কার বিভিন্ন গুহাচিত্রগুলি।

চিত্র ২২: আজিলিয় চিত্রিত নুড়ি

চিত্র ২৩: টার্ডেনয়সিয় হাতিয়ার

চিত্র ২৪: ম্যাগলেমোসিয় হাতিয়ার

বিশেষ করে স্পেনের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী একাধিক প্রত্নকেন্দ্র থেকে এ-ধরনের গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। ভ্যালেন্সিয়া গুহার কুভাস ডি লা আরানা এন বিকর্প বা মধু আহরণকারী মানুষের চিত্র, ক্যাটালোনিয়া গুহার এল কোগুল বা নৃত্যরত চিত্র প্রভৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কার চিত্রগুলিতে ক্রমশ জ্যামিতিক আঙ্গিক ছাড়া মূর্ত চিত্র অঙ্কন করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কালো ও লাল রঙেরও ব্যবহার দেখা যায়।

সামগ্রিকভাবে একথা বলা যায় যে, মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষ ক্রমশ আজকের মতোই জীবনযাপন প্রণালীর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। যদিও আর্থ-সামাজিকভাবে তার সংস্কৃতি ছিল তখনও খাদ্যসংগ্রাহক, কিন্তু খাদ্যসংগ্রহ করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। পশুপালন ও পরীক্ষামূলক কৃষির সূচনা দেখা দিয়েছিল। সর্বোপরি মানুষ যাযাবর বন্য জীবন থেকে ক্রমশ স্থায়ী আবাসিক জীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। আর এই কৃষি-পশুপালন নির্ভর স্থায়ী আবাসিক জীবন সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল নব্যপ্রস্তর যুগে, যাকে গর্ডন চাইল্ড তাঁর *ম্যান মেক্‌স্ হিমসেল্ফ* গ্রন্থে নবাশ্মীয় বিপ্লব বা Neolithic Revolution বলে অভিহিত করেছেন।

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

মধ্য প্রস্তর যুগের বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রের মধ্যে হাতিয়ারের ধরন, জীবনযাপন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু আঞ্চলিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্য প্রস্তর যুগীয় কেন্দ্রগুলির উপর গবেষণায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। তবে ইউরোপে এ-বিষয়ে গবেষণা বেশ অগ্রসর হয়েছে।

ইউরোপের মধ্য প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতিকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা দুটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা, এপিপ্যালিওলিথিক বা আদি মধ্য প্রস্তর যুগ এবং উচ্চ মধ্য প্রস্তর যুগ (Late stone age)। আদি মধ্য প্রস্তর যুগ হল উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে মধ্য প্রস্তর যুগে উত্তরণের মধ্যবর্তী পর্যায়। ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মধ্য প্রস্তর যুগীয় প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, রাশিয়া, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পর্তুগালের কাবেকো ডা আমোরিরা, কাবেকো ডা আরুডা; ফ্রান্সের ডোরনে, গাজেল, মন্টক্লুস, টেভিয়েক; বেলজিয়ামের বয়েস ল্যাটেরি, রেমোচ্যাম্পস; জার্মানির বেডবার্গ-কোনিগশোভেন, হোহ্‌লেনস্টেইন-স্টাডেল; ডেনমার্কের প্রেভালেরাপ, রিংক্লোস্টার, ডেজরো, ভেডবায়েক; গ্রিসের ফ্রান্‌চিতি; ইতালির উৎজো প্রভৃতি প্রত্নকেন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার শৈলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এর আকারের হ্রস্বতা। এ-কারণেই এই হাতিয়ার শৈলী ক্ষুদ্রাশ্ম বা Microlith নামে পরিচিত। ইউরোপের বিভিন্ন

প্রত্নকেন্দ্রে এই ক্ষুদ্রাশ্মেরও বেশ কিছু ধরন দেখা গেছে, অর্থাৎ কিছু আঞ্চলিক বৈচিত্র্য পাওয়া গেছে। এইসমস্ত আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে ইউরোপীয় ক্ষুদ্রাশ্মকে আবার কতকগুলি উপসংস্কৃতিতে ভাগ করা যায়। যেমন— আজিলিয় (Azilian), টার্ডেনয়সিয় (Tardenoision), ম্যাগলেমোসিয় (Maglemosian), কিচেন মিড্ডেন (Kitchen Midden), সউভেটের্‌রিয় (Sauveterrian), অসটুরিয় (Asturian), কুন্ডা (Kunda) সংস্কৃতি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আজিলিয় সংস্কৃতি পশ্চিম ইউরোপের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আদি-মধ্য প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতি। ফ্রান্সের পিরেনিজ অঞ্চলে আরিজের নিকটবর্তী মাস ডি'আজিল (Mas d'Azil) গুহা থেকে এই বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয় আজিলিয় সংস্কৃতি। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলে এবং জার্মানির বেয়র্নের অফনেট গুহায় অনুরূপ সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতিয়ারের ধরনের দিক থেকে বলা যায় যে, এই সংস্কৃতি হল ম্যাগডালেনিয় সংস্কৃতির উন্নত রূপ। ফ্রান্সের মধ্যভাগে ফেরে-এন-টার্ডেনোস (Fere-en-Tardenois) প্রত্নকেন্দ্র থেকে টার্ডেনয়সিয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণ অঞ্চলে সউভেটের্‌রিয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। হল্যান্ডের জিল্যান্ড অঞ্চলের ম্যাগলে মোস বোগল্যান্ড প্রত্নকেন্দ্রটি ম্যাগলেমোসিয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্য প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাধির নিদর্শন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একাধিক প্রত্নকেন্দ্রে সমাধির নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে হয় অধিবিদ্যক চেতনার উন্মেষ এই সময়ে দেখা গিয়েছিল। মানুষ মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী কোনো জীবনের চিন্তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ সমাধিতেই খাদ্য, বিভিন্ন মৃৎপাত্র ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্ভবত মৃতদেহের সঙ্গে তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র সমাহিত করার কোনো ধর্মীয় প্রথার ইঙ্গিত প্রদান করে এই নিদর্শনসমূহ। ইরফান হাবিব মধ্য প্রস্তর যুগকে মানুষের ধর্ম ও অধিবিদ্যক চিন্তা এবং কুসংস্কারের উন্মেষের পর্ব বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষের সংস্কৃতি সবদিক দিয়েই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছিল। ক্রমশই আদিম বন্যতা পরিত্যক্ত হয়ে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এর পরবর্তী স্তরই ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনের স্তর যা নবাশ্মীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল।